বিসর্জন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭
কাব্যগ্রন্থাবলী-সংস্করণ : আশ্বিন ১৩০৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩০৬
...
তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৩৩
চতুর্থ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৪১
গ্রন্থপরিচয়-সহ পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৪৬, চৈত্র ১৩৪৯, ফাল্গুন ১৩৫১, ভাদ্র ১৩৫৫
ভাদ্র ১৩৫৯, ফাল্গুন ১৩৬২, ভাদ্র ১৩৬৪, চৈত্র ১৩৬৬, আষাঢ় ১৩৬৮
অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, ভাদ্র ১৩৭২, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, শ্রাবণ ১৩৭৯
সংশোধিত ও পরিবর্ধিত গ্রন্থপরিচয় -সহ পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৮১, চৈত্র ১৩৮২
শ্রাবণ ১৩৮৬ : ১৯০১ শক

কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত কাগজে মুদ্রিত

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
মুদ্রক শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস। ৬৬ গ্রে স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণাধিকেষু

তোরি হাতে বাঁধা খাতা তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন্ একা আমি, গৃহকোণ
কাগজ-পত্তর ছড়াছড়ি।
দশ দিকে বইগুলি সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর।
তারি 'পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়,
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল—

এক ধারে রাশ রাশ অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ,
তারি 'পরে বালকের দল।
ধরে মাছ, মারে ঢেলা— সারাদিন করে খেলা
উভচর মানবশাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক্ ঝক্।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ-মাঝে—
বহুকষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গোরুর গাড়ি,
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া—
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু পা দুলাইয়া।

পরপারে গায়ে গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট-অশথেরা,
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা—
বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর—
সন্ধ্যাবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীতস্বর।

পূর্বপ্রান্তে বনশিরে সূর্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারি দিকে পাখির কূজন।
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণপরে দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যূষে মধুমাছি বাহিরায় মধু যাচি
কুসুমকুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
সেই ভোরবেলা আমি মানসকুহরে নামি
আয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখি-গান কানে বাজে,
মনে আনে কাল পুরাতন—
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্যধন।
আদিকবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তিভরে করেছে বীজন,
ওই মায়াচিত্রবৎ তরুলতা ছায়াপথ
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁষে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারি দিক, বর্তমান-আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
'আজ' 'কাল' দুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।

নিশিদিন ধূলি প'ড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য-বরিষন,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীর গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডি-বিরচন,
কেবলই নূতনে আশ, সৌন্দর্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিন-রাত—
সে-সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্ণে পড়ে তরুচ্ছায়া—
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়দোলায় দুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়—
ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে,
এত কথা কয় শত স্বরে,

তাহাদের তুলনায় আর-সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের ’পরে।
আজ সব হল সারা, বিদায় লয়েছে তারা,
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি—
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চলে
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।

তাই এতদিন পরে আজি নিজমূর্তি ধরে
প্রবাসের বিরহবেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে ‘কী এনেছ’ বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের ক’রে বলিব ‘এ পাতা ভ’রে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ’।

সেই ছবি মনে আসে— টেবিলের চারি পাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই-তিন ঊর্ধ্বে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি ঠাকুরানী।
দক্ষিণের দ্বার দিয়ে বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা।
খাতা হাতে সুর করে অবাধে যেতেছি পড়ে,
কেহ নাই করিবারে টীকা।

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারি ধার—
তোদের নয়নে জল ক'রে আসে ছলছল্
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্নরচনায়—
মনে মনে প্রাণ ভরি অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তার পরে দিন-কত কেটে যায় এইমত,
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি !'

শির নাড়ি কেহ কহে, 'সব-সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হ'ত আরো ভালো হলে।'
কেহ বলে, 'আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,
চিরদিন রবে না তা ব'লে।'
কেহ বলে, 'এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হ'ত যদি অন্য কোনোরূপ।'

যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়,
আমি শুধু বসে আছি চুপ।

ল'য়ে নাম, ল'য়ে জাতি, বিদ্বানের মাতামাতি—
ও-সকল আনিস নে কানে।
আইনের লৌহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে,
ভালো যার লাগে তার লাগে।

—রবিকাকা

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্ররায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজপুরোহিত
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক
	রাজমন্দিরের সেবক
চাঁদপাল	দেওয়ান
নয়নরায়	সেনাপতি
ধ্রুব	রাজপালিত বালক
মন্ত্রী	
পৌরগণ	
গুণবতী	মহিষী
অপর্ণা	ভিখারিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

গুণবতী

গুণবতী। মার কাছে কী করেছি দোষ! ভিখারি যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু— পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব! আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শতশত
দাস-দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব— এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,

ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!
কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে?

রঘুপতির প্রবেশ

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছু তো করি নি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম— তবে, কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী?

রঘুপতি। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বলো! পাষাণতনয়া
ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য
ধরো! এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণবতী। এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশো মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘুপতি পূজার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। কী আদেশ মহারাজ?

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে
বলি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?

জয়সিংহ। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে।— হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে— কোলে ক'রে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা।

জয়সিংহ। মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে, যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।

মা তাহারে নিয়েছেন— আমি তারে আর
ফিরাব কেমনে ?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন ?
মিছে কথা ! রাক্ষসী নিয়েছে তারে !

জয়সিংহ। ছি ছি,
ও কথা এনো না মুখে।

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন ! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা— তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার। মহারাজ, বলো তুমি—

গোবিন্দ। বৎসে, আমি বাক্যহীন— এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে ?

অপর্ণা। এই-যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত ? ওরে বাছনি আমার !
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারি দিকে ব্যাকুল নয়নে,
কম্পিত কাতর বক্ষে— মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না ?

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ। আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারি নে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর !

জয়সিংহের প্রতি

অপর্ণা। তুমি তো নিষ্ঠুর নহ— আঁখি-প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে। তবে এসো তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এসো। তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ। তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে! ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?

জনান্তিক হইতে

গোবিন্দ। যেথা আছে প্রেম।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। কোথা আছে প্রেম!—
অয়ি ভদ্রে, এসো তুমি
আমার কুটিরে। অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ।

[জয়সিংহ ও অপর্ণার প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

রাজা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

সভাসদ্‌গণ উঠিয়া

সকলে। জয় হোক মহারাজ!

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে

এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দ। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে

হইল নিষেধ।

নয়নরায়। বলি নিষেধ!

মন্ত্রী। নিষেধ!

নক্ষত্ররায়। তাই তো, বলি নিষেধ!

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি!

গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,

আজ জাগরণ! বালিকার মূর্তি ধ'রে

স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,

জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন

সহিল কি করে? সহস্র বৎসর ধ'রে

রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!

গোবিন্দ। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী

করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্ররায়। তাই তো, কি বলো মন্ত্রী,
এ বড়ো আশ্চর্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দ দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যেজন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবিন্দ। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।

রঘুপতি। এই কি হইল স্থির?

গোবিন্দ স্থির এই।

উঠিয়া

রঘুপতি। তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

ছুটিয়া আসিয়া

চাঁদপাল। হাঁ হাঁ! থামো! থামো!

গোবিন্দ। বোসো চাঁদপাল। ঠাকুর, বলিয়া যাও
মনোব্যথা লঘু করে যাও নিজ কাজে।

রঘুপতি। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা ? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম ? হরণ করিবে তাঁর
বলি ? হেন সাধ্য নাই তব, আমি আছি
মায়ের সেবক।

[প্রস্থান

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধীনের
স্পর্ধা মহারাজ। কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

চাঁদপাল। শান্ত হও সেনাপতি।

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির ?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না ?

গোবিন্দ। আর নহে মন্ত্রী,
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে ?
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল,
সে কি পাপ হতে পারে ?

রাজার নিরুত্তরে চিন্তা

নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী,
সে কি পাপ হতে পারে ?

মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন ক'রে যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তার অপমানে।

রাজার চিন্তা

নয়নরায়। ভেবে দেখো মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কি আছে অধিকার।

সনিশ্বাসে

গোবিন্দ। থাক্ তর্ক।
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে—
আজ হতে বন্ধ বলিদান।

[প্রস্থান

মন্ত্রী। একি হল!
নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী, এ কী হল! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু!
কী বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ?
চাঁদপাল। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

জয়সিংহ। মা গো, শুধু তুই আর আমি! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই— সারা দীর্ঘ
দিন! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন
তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয়!

নেপথ্যে গান

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়সিংহ। মা গো, একি মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্বাক্ নিশ্চল— উঠিলে জীবন্ত হয়ে
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী!

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই যাও আপন মনেই
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।

জয়সিংহ। কেবলই একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?

অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।

জয়সিংহ। সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশি আছে— যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ, যেন
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি— কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষাতরে— দূর হতে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্রদয়াভরে।
এত দয়া পাই নে কোথাও— যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

জয়সিংহ। যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে— দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।—
ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।
কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট
পাষাণসোপান যেন দেবীমন্দিরের।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। কঠিন? কঠিন বটে। বিধাতার মতো।
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর।

রঘুপতির প্রবেশ

পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া

জয়সিংহ। গুরুদেব!

রঘুপতি। যাও, যাও!

জয়সিংহ। আনিয়াছি জল।

রঘুপতি। থাক্, রেখে দাও জল।

জয়সিংহ। বসন?

রঘুপতি। কে চাহে
বসন!

জয়সিংহ। অপরাধ করেছি কি?

রঘুপতি। আবার!
কে নিয়েছে অপরাধ তব?—
ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়— সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী-'পরে। হায় হায়,
কলির দেবতা তোমরাও চাটুকার
সভাসদ্‌সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা
বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারিহস্ত আছ
জোড় করি! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু, দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দগ্ধ সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।

জয়সিংহের নিকটে গিয়া সস্নেহে

বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমা-'পরে— চিত্ত বড়ো
ক্ষুব্ধ মোর।

জয়সিংহ। কী হয়েছে প্রভু!

রঘুপতি। কী হয়েছে!

শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।

এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে!

জয়সিংহ। কে করেছে অপমান?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?

রঘুপতি। কারে! তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,

সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী

মহাকালী, সকলেরে করে অপমান

ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মা'র পূজা-বলি

নিষেধিল স্পর্ধাভরে!

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য!

রঘুপতি। হাঁ গো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য!

তোমার সকল-শ্রেষ্ঠ— তোমার প্রাণের

অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু

এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,

আমা-চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে

গোবিন্দমাণিক্য?

জয়সিংহ। প্রভু, পিতৃকোলে বসি

আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু

পূর্ণচন্দ্র-পানে— দেব, তুমি পিতা মোর,

পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।

কিন্তু একি বকিতেছি! কী কথা শুনিনু!

মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা? এ আদেশ কে মানিবে?

রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।

জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী ও পরিচারিকা

গুণবতী। কী বলিস? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রানীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে?
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তার? কে সে
দুরদৃষ্ট?

পরিচারিকা। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণবতী। বলিতে সাহস নাহি? এ কথা বলিলি
কি সাহসে? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয়?

পরিচারিকা। ক্ষমা করো।

গুণবতী। কাল সন্ধেবেলা ছিনু রানী ;
কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ করে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে—
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম ?
দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা
অবনত ? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল ?
ত্বরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণবতী। মহারাজ, শুনিতেছ ? মার দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দ। জানি তাহা।

গুণবতী। জান তুমি ! নিষেধ কর নি
তবু ! জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান !

গোবিন্দ। তারে ক্ষমা করো প্রিয়ে !

গুণবতী। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়—
এ শুধু কাপুরুষতা ! দয়ায় দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী।

গোবিন্দ। দেবী, আমি। অপরাধ আর

কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ।

গুণবতী। কী বলিছ মহারাজ!

গোবিন্দ। আজ
হতে, দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।

গুণবতী। কাহার নিষেধ?

গোবিন্দ। জননীর।

গুণবতী। কে শুনেছে?

গোবিন্দ। আমি।

গুণবতী। তুমি? মহারাজ, শুনে হাসি আসে।
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন!

গোবিন্দ। হেসো না মহিষী।
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

গুণবতী। কথা রেখে দাও মহারাজ! মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।

গোবিন্দ। মা'র
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে।

গুণবতী। কেমনে জানিলে?

গোবিন্দ। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার; সব পারে, আপনার ছায়া

কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া। স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণবতী। শুনিয়াছি আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাকো আপনার
অসংশয় নিয়ে— আমারে দুয়ার ছাড়ো,
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।

গোবিন্দ। দেবী, জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।

গুণবতী। আমিও পারি না।
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেইমত
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে।
যাও তুমি যাও।

গোবিন্দ। যে আদেশ মহারানী।

[প্রস্থান

রঘুপতির প্রবেশ

গুণবতী। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হতে!

রঘুপতি। মহারানী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। উঞ্ছবৃত্ত

দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে। কিন্তু,
এই বড়ো সর্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে। এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা— বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি, জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

গুণবতী। কী হবে ঠাকুর!

রঘুপতি। জানেন তা মহামায়া।
এই শুধু জানি— যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
ঊর্ধ্ব-পানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী ক'রে, মুহূর্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

গুণবতী। রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!

রঘুপতি। হা হা! আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্তে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রানী! দেবব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্ শতবার। ধিক্ লক্ষবার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্! ব্রহ্মশাপ কোথা!

ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক-সম আপনি দংশিছে।
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর।

পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত

গুণবতী। কী কর! কী কর
দেব! রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দোষীরে।
রঘুপতি। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।
গুণবতী। দিব।
যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত।
রঘুপতি। যে আদেশ
রাজ-অধীশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশ-বলে, ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ। ধন্য তোমরাই,
যতদিন নাহি জাগে কল্কি-অবতার।

[প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃপ্রবেশ

গোবিন্দ। অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে
সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে রাখে।
উন্মনা-উৎসুক-চিত্তে ফিরে ফিরে আসি।
গুণবতী। যাও, যাও, এসো না এ গৃহে। অভিশাপ
আনিয়ো না হেথা।
গোবিন্দ। প্রিয়তমে, প্রেমে করে

অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর। সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ।— যাই তবে
দেবী!

গুণবতী। যাও! ফিরে আর দেখায়ো না মুখ।

গোবিন্দ। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব।

[প্রস্থানোন্মুখ

পায়ে পড়িয়া

গুণবতী। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো নাথ! এতই কি
হয়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চলে যাবে? জান না কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ? ভালো, আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান— ক্ষমা করো!

গোবিন্দ। প্রিয়তমে, তোমা-’পরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ। জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য।

গুণবতী। মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্বলোক— ভুলে যাবে
দু দণ্ডের দুঃস্বপন। সেই আজ্ঞা করো।

ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত-অধিকার মাঝে।

গোবিন্দ। ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা। দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরই আছে অধিকার।

গুণবতী। ভিক্ষা, ভিক্ষা চাই! একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা
চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণ-সম,
নহে তা রাজার ধন— তাও জোড়করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার। প্রেমের দোহাই মানো
প্রিয়তম! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম-আকর্ষণ-বশে কর্তব্যের ত্রুটি।

গোবিন্দ। এই কি উচিত মহারানী? নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা—
সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হতে
অমৃত করিতে পান; সেথাও কি নাই
দয়াসুধা! গৃহমাঝে পুণ্যপ্রেম বহে,
তারও সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা! এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খুলিয়া—

ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ! এ শোণিত?
তবু করিব না রোধ?

মুখ ঢাকিয়া

গুণবতী। যাও, যাও তুমি!

গোবিন্দ। হায় মহারানী, কর্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ।

[প্রস্থান

কাঁদিয়া উঠিয়া

গুণবতী। ওরে অভাগিনী,
এতদিন এ কী ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে।
ছিল না সংশয়মাত্র, ব্যর্থ হবে আজ
এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান। ধিক্, কী সোহাগে পুত্রহীনা
পতিরে জানায় অভিমান! ছাই হোক
অভিমান তোর! ছাই এ কপাল! ছাই
মহিষীগরব! আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্দন! বুঝিয়াছি আপনার
স্থান— হয় ধূলিতলে নতশির, নয়
ঊর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

একদল লোকের প্রবেশ

নেপাল। কোথায় হে তোমাদের তিনশো পাঁঠা, একশো-এক মোষ? একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজটুকু পর্যন্ত দেখবার জো নেই। বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ-হাঁ করছে! খরচপত্র করে পুজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ। দেখ্, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিস নে। মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের এক-একটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে।

হারু। কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর, সেই ও-বছর, যখন ব্রত সাঙ্গ করে রানীমা পুজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল? তখন একবার দেখে যেতে পারো নি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আর, অলুক্ষুনে বেটারা এসেছিস আর মায়ের খোরাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল! তোদের এক-একটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে।

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস। আমাদের কি আর বলবার মুখ আছে! তা হলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি!

হারু। তা যা বলিস ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি। সেদিন ও ব্যক্তি শালা পর্যন্ত উঠেছিল, তার বেশি যদি একটা কথা বলত, কিংবা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বলছি, তা হলে আমি—

নেপাল। তা, চল্-না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু। তা, আয়-না। জানিস? এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়।

নেপাল। তা, নিয়ে আয়, তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই।

হারু। তোমরা সকলেই শুনলে।

গণেশ ও কানু। আর দূর কর্ ভাই, ঘরে চল্। আজ আর কিছুতে গা লাগছে না। এখন তোদের তামাশা তুলে রাখ্।

হারু। এ কি তামাশা হল? আমার মামাকে নিয়ে তামাশা! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ ও কানু। আর রেখে দে! তোর আপনার বাবাকে নিয়ে তুই আপনি মর্।

[সকলের প্রস্থান

রঘুপতি নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। মা'র 'পরে ভক্তি নাই তব?

নয়নরায়। হেন কথা
কার সাধ্য বলে? ভক্তবংশে জন্ম মোর।

রঘুপতি। সাধু সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরই লোক।

নয়নরায়। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরই দাস।

রঘুপতি। সাধু! ভক্তি তব
হউক অক্ষয়। ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক সঞ্চার অতি দুর্জয় শকতি।
ভক্তি তব তরবারি করুক শাণিত,

বজ্রসম দিক তাহে তেজ। ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।

নয়নরায়। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।

রঘুপতি। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল করো একত্রিত
মা'র কাজে। নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে।

নয়নরায়। যে আদেশ প্রভু। কে আছে মায়ের শত্রু?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

নয়নরায়। আমাদের মহারাজ?

রঘুপতি। লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো
তারে।

নয়নরায়। ধিক্ পাপ-পরামর্শ! প্রভু, একি
পরীক্ষা আমারে?

রঘুপতি। পরীক্ষাই বটে। কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড়ো চিন্তা, ছাড়ো দ্বিধা, কাল নাহি আর—
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত
প্রলয়ের শৃঙ্গসম— ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়নরায়। নাই চিন্তা, নাই
কোনো দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।

রঘুপতি। সাধু!

নয়নরায়। এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে,
মোর 'পরে হেন আজ্ঞা কেন? আমি হব
বিশ্বাসঘাতক! আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা হৃদয়ের বিশ্বাসের 'পরে,
সেই তাঁর অটল আসন— আপনি তা
ভাঙিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে?
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী—
মনুষ্যত্ব ভেঙে পড়ে যাবে, জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা-সম।

জয়সিংহ। ধন্য সেনাপতি, ধন্য!

রঘুপতি। ধন্য বটে তুমি; কিন্তু একি ভ্রান্তি তব।
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?

নয়নরায়। কী হইবে মিছে তর্কে? বুদ্ধির বিপাকে
চাহি না পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে— সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়নরায়।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। চিন্তা কেন দেব? এমনি বিশ্বাসবলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু!
সৈন্যবলে কোন্ কাজ! অস্ত্র কোন্ ছার!

যার 'পরে রয়েছে যে ভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।
চলো প্রভু, বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসীগণে, মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই।— ওরে, আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে— নির্ভয়ে আয় রে
তোরা মায়ের সন্তান! আয় পুরবাসী!

[জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রস্থান

পুরবাসীগণের প্রবেশ

অক্রূর। ওরে, আয় রে আয়!

সকলে। জয় মা!

হারু। আয় রে, মায়ের সামনে বাহু তুলে নৃত্য করি।

গান

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশ দিক আঁধার ক'রে মাতিল দিক্‌বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।
কালো কেশ উড়িল আকাশে।
রবি সোম লুকালো তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।

সকলে। জয় মা!

গণেশ। আর ভয় নেই।

কানু। ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায়?

গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য বেটাদের সইল না। তারা ভেগেছে।

হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য নয়, আমি তাদের এমনি শাসিয়ে দিয়েছি, তারা আর এমুখো হবে না। বুঝলে অক্রূরদা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম করবামাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।

অক্রূর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ঐ যার সেই ছুঁচোপানা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই বললে, 'ওরে, তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস, তোরা উত্তরের কী জানিস? উত্তর দিতে এসেছিস, উত্তরের জানিস কী?' শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি।

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালোমানুষটি, কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার জো নেই।

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু। শোনো একবার কথা শোনো। নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে?

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধরতে আরম্ভ করেছ। আচ্ছা, পিসে নয় তো পিসে নয়। তাতে তোমার সুখটা কী হল? আমার হল না ব'লে কি তোমারই পিসে হল।

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। শুনলুম সৈন্য আসছে। জয়সিংহ, অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া। মন্দিরের দ্বার আগলাতে

হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর ?

রঘুপতি। মায়ের পুজো বন্ধ করবার জন্য রাজার সৈন্য আসছে।

হারু। সৈন্য আসছে ! প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই।

কানু। আমরা কজনা, সৈন্য এলে কী করতে পারব ?

হারু। করতে সবই পারি— কিন্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায় ? লড়াই তো পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে ?

অক্রুর। তোর কথা রেখে দে। দেখছিস নে প্রভু রাগে কাঁপছেন ? তা ঠাকুর, অনুমতি করেন তো আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভালো। অমনি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়।

[সকলের প্রস্থানোদ্যম

সরোষে

রঘুপতি। দাঁড়া তোরা !

করজোড়ে

জয়সিংহ। যেতে দাও প্রভু— প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন, আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।

স্বগত

রঘুপতি। সে কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই— শুধু ভক্তি নয়।

প্রকাশ্যে

জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা।

বাহিরে বাদ্যোদ্যম

জয়সিংহ। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রানীর পূজা।

রানীর অনুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ

সকলে। ওরে, ভয় নেই— সৈন্য কোথায়? মার পূজা আসছে।

হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এদিকে আসছে না।

কানু। ঠাকুর, রানীমা পুজো পাঠিয়েছেন?

রঘুপতি। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন করো।

[জয়সিংহের প্রস্থান

পুরবাসীগণের নৃত্যগীত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দ। চলে যাও হেথা হতে— নিয়ে যাও বলি।
রঘুপতি, শোনো নাই আদেশ আমার?

রঘুপতি। শুনি নাই।

গোবিন্দ। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।

রঘুপতি। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে। কে আছিস,
আন্ মার পূজা।

বাদ্যোদ্যম

গোবিন্দ। চুপ কর্।

অনুচরের প্রতি

কোথা আছে

সেনাপতি, ডেকে আন্ ! হায় রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম। লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল,
বাহুবল দুর্বলতা করায় স্মরণ।

রঘুপতি। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে— তাই এত
দুঃসাহস ? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে মহারাজ, রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-এক দিন।

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ

নয়নের প্রতি

গোবিন্দ। সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধম কিঙ্করে—
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতামন্দিরে।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই।

চাঁদপাল। থামো সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক

যায় বহুদূরে। রাজ-ইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দ। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে। ধর্মাধর্ম
লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য শুধু
তব হাতে।

নয়নরায়। এ কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ, ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম, আছ প্রভু,
আছেন দেবতা।

গোবিন্দ। তবে ফেলো অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার! সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা।

চাঁদপাল। যে আদেশ
মহারাজ!

গোবিন্দ। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে।

নয়নরায়। চাঁদপালে! কেন মহারাজ?
এ অস্ত্র তোমার পূর্ব রাজপিতামহ
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে! ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও। স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাকো
এতদিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছি

বহু যত্নে, সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি-সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

চাঁদপাল। কথা আছে ভাই।

নয়নরায়। ধিক্।
চুপ করো!— মহারাজ, বিদায় হলেম।

[প্রণামপূর্বক প্রস্থান

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে। দেবতার
কার্যভার তুচ্ছ মানবের 'পরে, হায়
কী কঠিন!

রঘুপতি। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়,
ভেঙে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দ। বলি কার তরে?

জয়সিংহ। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোনো নিবেদন— একান্ত মিনতি
যুগলচরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘুপতি। ধিক্‌!

জয়সিংহ, ওঠো, ওঠো! চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্‌— গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা, করালকালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত! থাক্‌
পূজা, থাক্‌ বলি— দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এসো জয়সিংহ!

[রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রস্থান

গোবিন্দ। এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখে নি হায় কত ক্ষুদ্র তারা!
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়

নক্ষত্ররায়। কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব ?

রঘুপতি। কাল রাত্রে

স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্ররায়। আমি হব রাজা! হা হা! বল কী ঠাকুর!

রাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল!

রঘুপতি। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। বিশ্বাস না হয় মোর।

রঘুপতি। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে

তুমি, নাহিকো সন্দেহ।

নক্ষত্ররায়। নাহিকো সন্দেহ!—

কিন্তু, যদি নাই পাই ?

রঘুপতি। আমার কথায়

অবিশ্বাস!

নক্ষত্ররায়। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,

কিন্তু দৈবাতের কথা— যদি নাই হয়!

রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্ররায়। অন্যথা হবে না?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা-'পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে— বুঝেছ ঠাকুর?
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘুপতি। মন্ত্রীত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্ররায়। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু, হে ঠাকুর সবই যদি
জানো তুমি, বলো দেখি কবে রাজা হব।

রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষত্ররায়। রাজরক্ত চান!

রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। পাব কোথা।

রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্ররায়। তাঁরি রক্ত চাই!

রঘুপতি। স্থির
হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল—
বুঝেছ কি? শোনো তবে— গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে, আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।—

জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পারো, চলে যাও অন্য ঠাঁই।—
বুঝেছ নক্ষত্ররায়? দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই— শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা— জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্ররায়। সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

রঘুপতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্ররায়। বলে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে।

রঘুপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো! যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন; কার্যসিদ্ধি
যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্ররায়। হে মা কাত্যায়নী!

[প্রস্থান

জয়সিংহ। একি শুনিলাম! দয়াময়ী মাতঃ, একি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী!— গুরুদেব? হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!

রঘুপতি। আর
কী উপায় আছে বলো।
জয়সিংহ। উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হা ধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? একি পাপ!
রঘুপতি। পাপপুণ্য
তুমি কিবা জানো!
জয়সিংহ। শিখেছি তোমারি কাছে।
রঘুপতি। তবে এসো বৎস, আর-এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা
আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,

অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে—
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়সিংহ। থামো, থামো, থামো!—

মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপানলোভে।
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা
মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে—
তেমনি কি তোর ব্যবসায়? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে
কেন মেঘ হতে ঝরে আশীর্বাদসম

বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ-'পরে—
গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে— কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে, কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া ?—
ছলনা করেছ মোরে প্রভু ! দেখিতেছ
মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কিনা আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখো হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাসবশে।— বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্তপিয়াসিনী! নিবি মা আমার রক্ত,
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে !
দিব ছুরি বুকে ? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত
বড়ো কি লাগিবে ভালো ? ওরে, মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব ? ছলনা বুঝেছি আমি তব।
ভক্তহিয়া-বিদারিত এই রক্ত চাও !
দিয়েছিলে এই-যে বেদনা, তারি প'রে
জননীর স্নেহহস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শতগুণ। কিন্তু রাজরক্ত !
ছিছি ! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী !

রঘুপতি। বন্ধ হোক বলিদান
তবে !

জয়সিংহ। হোক বন্ধ।— না না গুরুদেব, তুমি
জানো ভালোমন্দ! সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।
বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী?

রঘুপতি। হায় বৎস, হায়! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?

জয়সিংহ। অবিশ্বাস? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে, বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন।

রঘুপতি। সত্য করে বলি, বৎস, তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক— পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে— তোরে আমি নারিব হারাতে

জয়সিংহ। মোর

স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের 'পরে।

রঘুপতি। ভালো ভালো,

সে কথা হইবে পরে— কল্য হবে স্থির।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

অপর্ণা

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

অপর্ণা। জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! কেহ নাই
এ মন্দিরে। তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মুরতি— কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!
আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ!
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন! কেন তারে
কৃপণের ধন-সম রেখে দিস পুঁতে

মন্দিরের তলে— দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন।
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা-কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা-তরে— প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চিররাত্রিদিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত!— ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। কে রে তুই এ মন্দিরে!
অপর্ণা। আমি ভিখারিনী।
জয়সিংহ কোথা?
রঘুপতি। দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী! জয়সিংহে চাহিস কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে, ওরে উপদেবী!
অপর্ণা। আমা হতে দেবীর কী ভয়? আমি ভয়
করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

চাহি না অনেক ধন,　　　রব না অধিক ক্ষণ

যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি—

তোমরা আনন্দে রবে　　　নব নব উৎসবে,

কিছু ম্লান নাহি হবে　গৃহভরা হাসি।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরসম্মুখে পথ

জয়সিংহ

জয়সিংহ। দূর হোক চিন্তাজাল! দ্বিধা দূর হোক!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক। কার্যের তো
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা—
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন; চারি দিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!— সেই সত্য, সেই সত্য!
পাপপুণ্য নাই, সেই সত্য! থাক্ চিন্তা,

থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক !—
কোথা যাও ভাই-সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে ? কুকী রমণীর নৃত্য হবে ?
আমিও যেতেছি।— এ ধরায় কত সুখ
আছে— নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল, মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারি দিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণী-সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারি দিক হতে— উঠে গীতগান,
বহে হাস্যপরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে। আমিও চলিনু।

গান

আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই
আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে।
তোরা কোন্ রূপের হাটে
চলেছিস ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে।
তোদের ওই হাসিখুশি দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে।
আমার এই বাধা টুটে—
নিয়ে যা লুটেপুটে—

পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ওই এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে!
এত-যে আনাগোনা,
কে আছে জানাশোনা—
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাকতে পারে?
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিনতে পারি দেখে তারে॥

দূরে অপর্ণার প্রবেশ

ওকি ও অপর্ণা, দূরে দাঁড়াইয়া কেন?
শুনিতেছ অবাক হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি— তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটো কথা নিয়ে
এতই কৌতুকহাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।
সত্য যদি হত, তবে হত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি।
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়,

ফেটে গিয়ে সংগীত নীরব হত তার।
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি— শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা-ব্যাঘ্রিনীর খরনখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্মকাজ!
সত্য হলে এমন কি হত? হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও— বিষণ্ণ বিস্ময়ে, মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস চেয়ে! আয় সখী,
চিরদিন চলে যাই দুইজনে মিলে
সংসারের 'পর দিয়ে, শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড-সম।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। তোমারে চিনি নে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।
তুমি কি বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি
চলে যাও— আমি চলে যাই।

রঘুপতি। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিনী সখী মোর। কে বলিল, এই

সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল।
যেমন করেই যাই, দিবা অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে,
আচার বিচার তর্ক বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে—
দু-চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুল-ভ্রান্তি ভয় দুঃখ-সুখ,
ক্ষীণ-হৃদয়ের আশা, দুর্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে, গভীর বিশ্রাম।
এই তো সংসার! কী কাজ শাস্ত্রের বিধি!
কী কাজ গুরুতে!

প্রভু! পিতা! গুরুদেব!

কী বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ!
এই সে মন্দির— ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মতো। কী আদেশ দেব!
ভুলি নাই কী করিতে হবে। এই দেখো—

ছুরি দেখাইয়া

তোমার আদেশস্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কী আদেশ আছে
প্রভু!

রঘুপতি। দূর করে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে।— মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক।— দূর করে দাও ওরে!

জয়সিংহ। দূর করে দিব? দরিদ্র আমারি মতো
মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ, নিষ্পাপ, শুভ্র, সুন্দর, সরল,
সুকোমল, বেদনাকাতর— দূর করে
দিতে হবে ওরে? তাই দিব গুরুদেব!—
চলে যা অপর্ণা! দয়ামায়া স্নেহপ্রেম
সব মিছে!— মরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু।— চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই।

জয়সিংহ। দুইজনে
চলে যাই। এ তো স্বপ্ন নয়। একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ।
তাই হেসেছিনু সুখে, গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে। বোলো না সুখের কথা
আর, দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।

রঘুপতি। জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের! দূর করে

দাও ওই বালিকারে।

জয়সিংহ। চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। কেন যাব!

জয়সিংহ। এই নারী-অভিমান তোর?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষন রহিবি হেথায়।—
চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব। আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

[প্রস্থান

রঘুপতি। বৎস, তোলো মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয়, প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস? আমি আজন্মের বন্ধু, দু দণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ?

জয়সিংহ। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর। কর্তব্য রহিল শুধু মনে।

স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে-যায়
শুকায়-মিলায় নব নব স্বপ্ন-বৎ।
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম।

[প্রস্থান

রঘুপতি। জয়সিংহ, কিছুতে পাই নে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ

জনতা

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না।

অক্রূর। এবারে আর লোক হবে কী করে? এ তো আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠল। ঠাকরুনের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, তো মেলায় লোক আসবে কী!

কানু। ভাই, রাজার তো এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েছে।

অক্রূর। যদি পেয়ে থাকে তো কোন্ মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন?

গণেশ। কিন্তু যাই বলো, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

কানু। পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বলে দিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন, যেরকম দেখছি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখো-না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধরে ব্যামোয় ভুগে ভুগে বরাবরই তো বেঁচে এসেছে, ঐ যেমন বলি বন্ধ হল অমনি মারা গেল।

অক্রূর। না রে, সে তো আজ তিন মাস হল মরেছে।

হারু। নাহয় তিন মাসই হল, কিন্তু এই বছরেই তো মরেছে বটে।

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে কে জানত। তিন দিনের জ্বর— ঐ, যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উলটে গেল।

গণেশ। সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানি চালা বাকি রইল না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কী! দেখো-না কেন, এ বছর ধান যেমন সস্তা হয়েছে এমন আর কোনোবার হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে!

হারু। ঐ রে, রাজা আসছে। সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখলুম, দিন কেমন যাবে কে জানে। চল্, এখান থেকে সরে পড়ি।

[সকলের প্রস্থান

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারি দিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,

তব প্রাণহত্যা-তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দ। প্রাণহত্যা! কে করিবে?

চাঁদপাল। বলিতে সংকোচ মানি। ভয় হয়, পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।

গোবিন্দ। অসংকোচে বলে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ?

চাঁদপাল। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।

গোবিন্দ। নক্ষত্র!

চাঁদপাল। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে
সব কথা।

গোবিন্দ। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!

চাঁদপাল। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

গোবিন্দ। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ! জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই,
যাও তুমি কাজে। সাবধানে রব আমি।

[চাঁদপালের প্রস্থান

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি মহাদেবী!
ভক্তি শুধু— হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়োই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রুর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ— গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে
হেথা স্নেহ-প্রেম অতি ক্ষীণ বৃন্তে থাকে,
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও, জননী, যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্বাসিত। আর নহে আর নহে, ছাড়ো
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয় নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয়রূপ তব?
এই-যে উঠিছে খড়্গ চারি দিক হতে
মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ, এ কি তোরি
চারি ভুজ হতে? তাই হবে! তবে তাই
হোক। বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,

সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী আকার! এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্, বল্ নিজ মুখে, বল্
মানবভাষায়, বল্ শীঘ্র— সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?

নেপথ্যে। চাই।

জয়সিংহ। তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্টদেবতার! কাল তব
নিকটে এসেছে।

গোবিন্দ। কী হয়েছে জয়সিংহ?

জয়সিংহ। শুনিলে না নিজকর্ণে? দেবীরে শুধানু
সত্যই কি রাজরক্ত চাই— দেবী নিজে
কহিলেন 'চাই'।

গোবিন্দ। দেবী নহে, জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ। কহিলেন রঘুপতি?
অন্তরাল হতে?— নহে নহে, আর নহে!
কেবলই সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে

নামিতে পারি নে আর। যখনি কূলের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাসদৈত্য!
আর নহে! গুরু হোক্ কিম্বা দেবী হোক্,
একই কথা!—

ছুরিকা উন্মোচন।... ছুরি ফেলিয়া

ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়! এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মতো।
নিতে হবে! এই নিতে হবে! আমি
নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব।
রাঙা' তোর আঁখি! তোল্ তোর খড়্গ! আন্
তোর শ্মশানের দল! আমি নাহি ডরি।

[গোবিন্দমাণিক্যের প্রস্থান

এ কী হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু— বিশ্বমাঝে
কিছু রহিল না আর!

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। সকল শুনেছি

আমি। সব পণ্ড হল। কী করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ!

জয়সিংহ। দণ্ড দাও প্রভু!

রঘুপতি। সব ভেঙে
দিলি? ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হতে! লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়ো! আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে!

জয়সিংহ। দণ্ড
দাও পিতা!

রঘুপতি। কোন্ দণ্ড দিব?

জয়সিংহ। প্রাণদণ্ড।

রঘুপতি। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই। স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ।

জয়সিংহ। করিনু পরশ।

রঘুপতি। বল্ তবে, 'আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।'

জয়সিংহ। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘুপতি। চলে যাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

জনতা। রঘুপতি ও জয়সিংহ

রঘুপতি। তোরা এখানে সব কী করতে এলি?

সকলে। আমরা ঠাকরুন দর্শন করতে এসেছি।

রঘুপতি। বটে। দর্শন করতে এসেছ? এখনো তোমাদের চোখ-দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে। ঠাকরুন কোথায়? ঠাকরুন এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কই? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কী সর্বনাশ! সে কি কথা ঠাকুর! আমরা কী অপরাধ করেছি।

নিস্তারিণী। আমার বোনপো'র ব্যামো ছিল বলেই যা আমি কদিন পুজো দিতে আসতে পারি নি।

গোবর্ধন। আমার পাঁঠা-দুটো ঠাকরুনকেই দেব বলে অনেক দিন থেকে মনে করে রেখেছিলুম, এরই মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে দিলে তো আমি কী করব!

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মা'ও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে— আজ ছটি মাস বিছানায় পড়ে।

তা বেশ হয়েছে, আমাদেরই যেন সে মহাজন, তাই বলে কি মাকে ফাঁকি দিতে পারবে!

অক্রূর। চুপ কর্ তোরা। মিছে গোল করিস নে। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হয়েছিল?

রঘুপতি। মার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি।

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কী করব?

রঘুপতি। রাজা কে? মার সিংহাসন তবে কী রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কী ক'রে রক্ষা করে।

সকলের সভয়ে গুন্ গুন্ স্বরে কথা

অক্রূর। চুপ কর্।— সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে, মা তাকে দণ্ড দিক্, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মা'র মতো কাজ? বলে দাও কী করলে মা ফিরবে।

রঘুপতি। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন

রঘুপতি। তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুনকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্।

মন্দিরের দ্বার-উদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান

সকলে। ওকি! মার মুখ কোন্ দিকে?

অক্রূর। ওরে, মা বিমুখ হয়েছেন!

সকলে। ও মা, ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা। আমরা তোকে ছাড়ব না। চাই নে আমাদের রাজা! যাক রাজা! মরুক রাজা!

রঘুপতির নিকট আসিয়া

জয়সিংহ। প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সমস্তই কি বিশ্বাস করব?

রঘুপতি। হাঁ।

অপর্ণার প্রবেশ

পার্শ্বে আসিয়া

অপর্ণা। জয়সিংহ! এসো জয়সিংহ, শীঘ্র এসো
এ মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ। বিদীর্ণ হইল বক্ষ।

[রঘুপতি অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রস্থান

রাজার প্রবেশ

প্রজাগণ। রক্ষা করো মহারাজ, আমাদের রক্ষা
করো— মাকে ফিরে দাও।

গোবিন্দ। বৎসগণ, করো

অবধান। সেই মোর প্রাণপণ সাধ—
জননীরে ফিরে এনে দেব।

প্রজাগণ। জয় হোক
মহারাজ, জয় হোক তব!

গোবিন্দ। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিস নি জনম? মাতৃগণ তোমরা তো
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা— বলো দেখি মা কি নেই?
মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে। আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর— চোখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস— বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে দুর্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ
কি এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল

চিরমাতৃহীন করে অনাথ সংসার।
বৎসগণ, মাতৃগণ, বলো, খুলে বলো—
কী এমন করিয়াছি অপরাধ ?

কেহ কেহ। মা'র
বলি নিষেধ করেছ! বন্ধ মা'র পূজা ?

গোবিন্দ। নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা! আসিছে মড়ক,
উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, রক্তপাত—
মা তোদের এমনি মা বটে! দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপানলোভে ?
হেন মাতৃ-অপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না ? মনে পড়িল না মা'র
মুখ ?— 'রক্ত চাই' 'রক্ত চাই' গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর— নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়—
এই কি মায়ের পরিবার ? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহছবি ?

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারি নে।

গোবিন্দ। বুঝিতে পারো না! শিশু
দুদিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও

তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে, ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে ; সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে ; সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মার মুখ চেয়ে।— তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মাকে গেলি
ভুলে ? বুঝিতে পারো না মাতা দয়াময়ী !
বুঝিতে পারো না জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে !
বুঝিতে পারো না— ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল ! ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভর্ৎসনা অভিমান-ভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর ! দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হতে— সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার ?

অপর্ণার প্রবেশ

প্রজাগণ। আপনি চাহিয়া দেখো,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের 'পরে !

মন্দিরের দ্বারে উঠিয়া

অপর্ণা। বিমুখ হয়েছে মাতা! আয় তো মা, দেখি,
আয় তো সমুখে একবার!

প্রতিমা ফিরাইয়া

এই দেখো
মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে। ফিরেছে জননী!
জয় হোক! জয় হোক!

সকলে মিলিয়া গান

থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই?
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই?
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কই?

[সকলের প্রস্থান

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ। সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ!

রঘুপতি। সত্য
কেন না বলিব? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কী বলিতে
চাও, বলো। হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কী ভর্ৎসনা করিবে আমারে? দিবে কোন্
উপদেশ?

জয়সিংহ। বলিবার কিছু নাই মোর।

রঘুপতি। কিছু নাই? কোনো প্রশ্ন নাই মোর কাছে?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু-উপদেশ? এত দূরে
গেছ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ?
মূঢ়, শোনো! সত্যই তো বিমুখ হয়েছে
দেবী, কিন্তু তাই বলে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে। মন্দিরে যে রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে
সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব? চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে— কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারি দিকে
ফাটিয়া পড়েছে; সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার 'মহামিথ্যা'। সত্য
মহারাজ বসে থাকে রাজ-অন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে

মরে খেটে খেটে।— শিরে হাত দিয়ে, ব'সে
ব'সে ভাবো— আমার অনেক কাজ আছে!
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়সিংহ। যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে— সবই
মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই?
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য ও চাঁদপাল

চাঁদপাল। প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ লাগি, নিকটেই আছে, দুই-চারি
দিবসের পথে— প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হতে।

গোবিন্দ। আমারে করিবে দূর?
মোর 'পরে এত অসন্তোষ?

চাঁদপাল। মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখো— পশুরক্ত
এত যদি ভালো লাগে নিষ্ঠুর প্রজার,
দাও তাহাদের পশু ; রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক। সর্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি, কখন কী হয়ে পড়ে।

গোবিন্দ। আছে ভয় জানি চাঁদপাল, রাজকার্য
সেও আছে। পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে।— গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে?

চাঁদপাল। এতক্ষণে গেছে।

গোবিন্দ। চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,
মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ।

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু।

[প্রস্থান

গুণবতীর প্রবেশ

গোবিন্দ। প্রিয়ে, বড়ো শুষ্ক,
বড়ো শূন্য এ সংসার। অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালোবেসে চাও মুখপানে। প্রেমহীন
অন্ধকার-ষড়যন্ত্র বিপদ বিদ্বেষ

সবার উপরে হোক তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্নিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন? অপরাধ-বিচারের
এই কি সময়? তৃষার্ত হৃদয় যবে
মুমূর্ষুর মতো চাহে মরুভূমিমাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে চলে যাবে?

[গুণবতীর প্রস্থান

চলে

গেলে! হায় দুর্বহ জীবন!

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

স্বগত

নক্ষত্ররায়। যেথা যাই সকলেই বলে 'রাজা হবে?'—
'রাজা হবে?'— এ বড়ো আশ্চর্য কাণ্ড। একা
বসে থাকি, তবু শুনি কে যেন বলিছে—
'রাজা হবে?' 'রাজা হবে?' দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখি, এক
বুলি জানে শুধু— 'রাজা হবে?' 'রাজা হবে?'
ভালো বাপু, তাই হব, কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি?

গোবিন্দ। নক্ষত্র?

নক্ষত্র সচকিত

নক্ষত্র,

আমারে মারিবে তুমি? বলো, সত্য বলো,

আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্বাদ
করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহারকালে
এক অন্ন ভাগ করে করেছ ভোজন
এই কথা নিয়ে ? বুকে ছুরি দেবে ? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্তভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিল যবে— এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যেদিন জননী, তোর
শিরে শেষ স্নেহহস্ত রেখে, চলে গেল
ধরাধাম শূন্য করি— আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি ? এক রক্তধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে
চিরদিন ভাইদের শিরায় শিরায়—
সেই শিরা ছিন্ন করে দিয়ে, সেই রক্ত,
ফেলিবি ভূতলে ? এই বন্ধ করে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারি, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম !

নক্ষত্ররায়। ক্ষমা করো ! ক্ষমা করো ভাই ! ক্ষমা করো !

গোবিন্দ। এসো বৎস, ফিরে এসো ! সেই বক্ষে ফিরে
এসো ! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ ? এ সংবাদ

শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা।
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি।

নক্ষত্ররায়। রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা! রক্ষ মোরে
তার কাছ হতে!

গোবিন্দ। কোনো ভয় নেই ভাই!

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরকক্ষ

গুণবতী

গুণবতী। তবু তো হল না। আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছুদিন যদি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহংকার ছিল
মনে। মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই,
অশ্রুও ফেলি নে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু
অবহেলা— এমন তো কতদিন গেল।
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে—
হীরকের দীপ্তিসম! ধিক্ থাক্ শোভা!
এ রোষ বজ্রের মতো হ'ত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ-'পরে, ভাঙিত রাজার

নিদ্রা, চূর্ণ হ'ত রাজ-অহংকার, পূর্ণ
হ'ত রানীর মহিমা! আমি রানী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস! হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব— এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিঙ্করী শুধু,
রানী নহি— তাহা হলে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হ'ত না!

ধ্রুবের প্রবেশ

কোথা যাস তুই?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা।

[প্রস্থান

গুণবতী। রাজার হৃদয়রত্ন এই সে বালক!
ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস তুই
আমার সন্তানতরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ-'পরে তুই বসাইলি ভাগ!
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি— রাজপুত্র এসে
তোরই কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী!—
মা গো মহামায়া, একি তোর অবিচার!
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর— খেলাচ্ছলে

দে আমারে একটি সন্তান— দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে
যায় যাহে। তুই যা বাসিস ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

নক্ষত্র, কোথায় যাও? ফিরে
যাও কেন? এত ভয় কারে তব? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়
অসহায়— আমি কি ভীষণ এত?

নক্ষত্ররায়। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না!

গুণবতী। কেন, কী হয়েছে?

নক্ষত্ররায়। আমি
রাজা নাহি হব।

গুণবতী। নাই হলে। তাই বলে
এত আস্ফালন কেন?

নক্ষত্ররায়। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি!

গুণবতী। তাই মরো! শীঘ্র মরো! পূর্ণ হোক
মনোরথ। আমি কি তোমার পায়ে ধ'রে
রেখেছি বাঁচিয়ে?

নক্ষত্ররায়। তবে কী বলিবে বলো।

গুণবতী। যে চোর করিছে চুরি তোমারই মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি?

নক্ষত্ররায়। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।

গুণবতী। ওই-যে বালক ধ্রুব! বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্ররায়। তাই বটে! এতক্ষণে
বুঝিলাম সব। মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়! আমি বলি শুধু খেলা।

গুণবতী। মুকুট লইয়া খেলা! বড়ো কাল-খেলা!
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা— নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলেনা।

নক্ষত্ররায়। তাই বটে!
এ তো ভালো খেলা নয়।

গুণবতী। অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে— পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি?

নক্ষত্ররায়। বুঝিয়াছি।

গুণবতী। তবে যাও! যা বলিনু করো।
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন!

নক্ষত্ররায়।   তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কী
সর্বনাশ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক— বুঝিতে কিছুই বাকি নেই

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরসোপান

জয়সিংহ

জয়সিংহ।   দেবী আছ, আছ তুমি! দেবী, থাকো তুমি।
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাকো কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
'বৎস, আছি!'— নাই, নাই, নাই, দেবী নাই!
নাই? দয়া করে থাকো! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই?— এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ! সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য -মাঝে!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা, আবার এসেছিস? তাড়ালেম

মন্দিরবাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে-পাশে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াস
সুখের দুরাশা-সম দরিদ্রের মনে ?—
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই !
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দিরবাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
অপর্ণা, যাস নে তুই— তোরে আমি আর
ফিরাব না। আয়, এইখানে বসি দোঁহে।
অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু-অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন!
অপর্ণা, বিষাদময়ী, তোরেও কি গেছে
ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা ? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক ? কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো সুখের সংসারে ?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে ? পাষাণের
মতো শুধু চেয়ে থাকে ! আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে— সে কি তার কোনো কাজে লাগে ?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি—
সে কোথায় চায় ? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে,

তুচ্ছ বটে, তবু তো আমার মাতৃধরা ;
তার কাছে কীটবৎ, তবু তো আমার
ভাই ; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত,
উপেক্ষিত, তারা তো আমার আপনার।
আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই ? স্বরগের ঐশ্বর্য ত্যজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই—
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি ? আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয়বিশ্বাসসুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার ?— অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই ?

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এসো, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়সিংহ। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব ! হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব। থাক্ ও-সকল কথা।
দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত— কলধ্বনি তার

এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ— বহুরাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই! থাক্
দেবী। অপর্ণা, জানিস কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল্।
যা শুনিলে মুহূর্তে অতলে মগ্ন হয়ে
ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ। অপর্ণা, অমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু-আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারি দিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারি নে কিছু—
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়সিংহ। তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক কথা।
—এ কী করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা,

চলে যা মন্দির ছেড়ে !— গুরুর আদেশ !

অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর ! বার বার
ফিরায়ো না ! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে !

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।

কিয়দ্দুর গিয়া, ফিরিয়া

অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি ? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর কঠিন !
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা ?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে ? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে ?
অপর্ণা, সে-সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে ?—
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস,
তুই যদি বুঝিতিস এই অন্তর্দাহ !

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী-হিয়া,
ক্ষমা করো এরে। এই বেলা চলে এসো,
জয়সিংহ, এসো মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই।

জয়সিংহ। রক্ষা করো ! অপর্ণা, করুণা করো !
দয়া করে, মোরে ফেলে চলে যাও। এক
কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক

প্রাণেশ্বর— তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না।

[দ্রুত প্রস্থান

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে ! আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ !

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

নক্ষত্ররায় রঘুপতি ও নিদ্রিত ধ্রুব

রঘুপতি। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি ক'রে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারি দিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে ! ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্ররায়। ঠাকুর, কোরো না দেরি আর—
ভয় হয়, কখন সংবাদ পাবে রাজা।

রঘুপতি। সংবাদ কেমন করে পাবে ? চারি দিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

নক্ষত্ররায়। একবার
মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘুপতি। আপন ভয়ের।

নক্ষত্ররায়। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর।

রঘুপতি। আপনার হৃদয়ের।—
দূর হোক নিরানন্দ। এসো পান করি
কারণসলিল।

মদ্যপান

মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ—
কার্যকালে ছোটো হয়ে আসে বহু বাষ্প
গলে গিয়ে একবিন্দু জল। কিছুই না,
শুধু মুহূর্তের কাজ। শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ। ঘুম হতে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণরেখাটুকু শ্রাবণনিশীথে
বিজুলিঝলক-সম, শুধু বজ্র তার
চিরদিন বিঁধে রবে রাজদম্ভ-মাঝে।
এসো এসো যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ এক পাশে— মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্বাপিতপ্রায়! এসো, পান
করি আনন্দসলিল।

নক্ষত্ররায়। অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে। আমি বলি, আজ থাক্‌। কাল
পূজা হবে।

রঘুপতি। বিলম্ব হয়েছে বটে! রাত্রি
শেষ হয়ে আসে।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো, পদধ্বনি।

রঘুপতি। কই? নাহি শুনি।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো, ওই দেখো
আলো।

রঘুপতি। সংবাদ পেয়েছে রাজা! আর তবে
এক পল দেরি নয়! জয় মহাকালী!

খড়্গ উত্তোলন

গোবিন্দমাণিক্য ও প্রহরীগণের দ্রুত প্রবেশ
রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা
রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল

গোবিন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিচারসভা

গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতি নক্ষত্ররায়

সভাসদ্‌গণ ও প্রহরীগণ

রঘুপতিকে

গোবিন্দ। আর-কিছু বলিবার আছে?

রঘুপতি। কিছু নাই।

গোবিন্দ। অপরাধ করিছ স্বীকার?

রঘুপতি। অপরাধ?

অপরাধ করিয়াছি বটে। দেবীপূজা
করিতে পারি নি শেষ— মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু।

গোবিন্দ। শুন সর্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ রাজ-আজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্বাসনদণ্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অষ্ট বর্ষ নির্বাসনে করিবে যাপন—

তোমরা আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে।

রঘুপতি। দেবী ছাড়া এ জগতে
এ জানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র, তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে,
নতজানু, আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা-কাছে— দুই দিন দাও অবসর,
শ্রাবণের শেষ দুই দিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে— চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দ। দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘুপতি। মহারাজ! রাজ-অধিরাজ!
মহিমাসাগর তুমি কৃপা-অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন,অভাজন!

[প্রস্থান

গোবিন্দ। নক্ষত্র, স্বীকার করো অপরাধ তব।

নক্ষত্ররায়। মহারাজ, দোষী আমি। সাহস না হয়
মার্জনা করিতে ভিক্ষা।

পদতলে পতন

গোবিন্দ। বলো তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত?

স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্ররায়। আর কারে দিব দোষ!
লব না এ পাপমুখে আর কারো নাম।
আমি শুধু একা অপরাধী। আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা করো।

গোবিন্দ। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠো, শোনো কথা। ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী। এক অপরাধে
দণ্ড পাবে এক জনে, মুক্তি পাবে আর,
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার— আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু!
নক্ষত্র তোমার ভাই।

গোবিন্দ। স্থির হও সবে।
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্রনদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্ট বর্ষ নির্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত। রাজার
সিংহাসন হইতে অবরোহণ

দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন। ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার। আজ হতে রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্বাদ মোর ;
যতদিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ।

[নক্ষত্রের প্রস্থান

সভাসদ্‌গণের প্রতি

সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে,
ক্ষণেক একেলা রব আমি।

[সকলের প্রস্থান

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। মহারাজ,
সমূহ বিপদ।

গোবিন্দ। রাজা কি মানুষ নহে ?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড় নি কি
অতিদীন দরিদ্রের সমান করিয়া ?
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবারে অবসর দিবে না কি শুধু ?—
কিসের বিপদ, ব'লে যাও শীঘ্র করি।

নয়নরায়। মোগলের সৈন্য-সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দ। এ নহে, নয়নরায়,
তোমার উচিত। শত্রু বটে চাঁদপাল,
তাই বলে তার নামে হেন অপবাদ!

নয়নরায়। অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি!
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই ব'লে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে!

গোবিন্দ। ভালো করে
বলো আরবার, বুঝে দেখি সব।

নয়নরায়। যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।

গোবিন্দ। তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ?

নয়নরায়। যেদিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে চলে
গেনু দেশান্তরে; শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ; তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে,

সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তার
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে।

গোবিন্দ। সহসা এ কী হল সংসারে হে বিধাতঃ!
শুধু দুই-চারি দিন হল, ধরণীর
কোন্‌খানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারি দিকে পৃথিবীর 'পরে—
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল!—
এখন সময় নহে
বিস্ময়ের। সেনাপতি, লহ সৈন্যভার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ

জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘুপতি। গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব।
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে

তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহারভরে
খদ্যোত ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়।
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে—
বারেক নিভিলে তারা চির-অন্ধকার!
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন; সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে। জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায়। কালামুখ তার
রাজরক্তে রাঙা করে তবে যায় যেন।
বৎস, কেন নিরুত্তর? গুরুর আদেশ
নাহি আর; তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ?
নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা ব'লে? এই দুঃখ,
এত করে স্মরণ করাতে হল! কৃপা-
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগা, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে। বৎস, তবু নিরুত্তর? জানু তবে

আরবার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো— তার কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

জয়সিংহ। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব! যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে।

[প্রস্থান

রঘুপতি। তবে তাই
হোক। দেবী চাহে, তাই ব'লে দিস। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কী করেছে? শিশুকাল হতে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে? হায়, কলিকাল! থাক্!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য

নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধসজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই— আশীর্বাদ
করো—

গোবিন্দ। চলো সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে।

নয়নরায়। যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে ততক্ষণ, মহারাজ, ক্ষান্ত
থাকো, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দ। সেনাপতি
সবার বিপদ-অংশ হতে, মোর অংশ
নিতে চাই আমি। মোর রাজ-অংশ, সব
চেয়ে বেশি। এসো সৈন্যগণ, লহ মোরে
তোমাদের মাঝে। তোমাদের নৃপতিরে
দূর সিংহাসনচূড়ে নির্বাসিত করে
সমরগৌরব হতে বঞ্চিত কোরো না।

চরের প্রবেশ

চর। নির্বাসনপথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী-পানে।

গোবিন্দ। চুকে গেল।
আর ভয় নাই। যুদ্ধ তবে গেল মিটে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। বিপক্ষশিবির হতে পত্র আসিয়াছে।

গোবিন্দ। নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।— এই কি স্নেহের সম্ভাষণ!
এ তো নহে নক্ষত্রের ভাষা! চাহে মোর
নির্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা— দগ্ধ করে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুরতরে
ত্রিপুররমণী?— দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি! 'মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য'?
মহারাজ! দেখো সেনাপতি— এই দেখো
রাজদণ্ডে-নির্বাসিত দিয়েছে রাজারে
নির্বাসনদণ্ড। এমনি বিধির খেলা!

নয়নরায়। নির্বাসন! একি স্পর্ধা! এখনো তো যুদ্ধ
শেষ হয় নাই।

গোবিন্দ। এ তো নহে মোগলের
দল। ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে
করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন?

নয়নরায়। রাজ্যের মঙ্গল—

গোবিন্দ। রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে— গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?
দেখি দেখি আরবার— এ কি তার লিপি?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে। আমি
দস্যু, আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে নহে,
এ তার রচনা নহে— রচনা যাহারই
হোক্, অক্ষর তো তারি বটে। নিজ হস্তে
লিখেছে তো সেই। যে সর্পেরই বিষ হোক,
নিজের অক্ষরমুখে মাখায়ে দিয়েছে,
হেনেছে আমার বুকে।— বিধি, এ তোমার
শাস্তি, তার নহে। নির্বাসন! তাই হোক।
তার নির্বাসনদণ্ড তার হয়ে আমি
নীরবে বিনম্র শিরে করিব বহন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির। বাহিরে ঝড়

রঘুপতি

পূজোপকরণ লইয়া

রঘুপতি। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষহুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী!— ওই বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু।
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস!
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে, হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা! জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ, দূর হ মায়াবিনী—
জয়সিংহে চাস তুই ? আরে সর্বনাশী !
মহাপাতকিনী !

[অপর্ণার প্রস্থান

এ কী অকালব্যাঘাত !
জয়সিংহ যদি নাই আসে ! কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার।— জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী !
যদি বাধা পায়— যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে !
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায় !
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া !
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি !
জয়সিংহ বটে ! জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি !

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই ?

জয়সিংহ। আছে আছে ! ছাড়ো মোরে।

নিজে আমি করি নিবেদন।— রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা! আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ— রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা!

বক্ষে ছুরি বিদ্ধন

রঘুপতি। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর!
এ কী সর্বনাশ করিলি রে! জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন!
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ!

রঘুপতি। আয় মা অমৃতময়ী! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা, মা, আপনার কাছে— আমি নাহি
চাহি।

[অপর্ণার মূর্ছা]

প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

গোবিন্দমাণিক্য ও নয়নরায়

গোবিন্দ। এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে
রাজধানী-বহির্দ্বারে বিজয়তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহু-সম! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসি নি, ছাড়ি নাই সিংহাসন!
এতদিন রাজা ছিনু: কারো কি করি নি
উপকার! কোনো অবিচার করি নাই
দূর! কোনো অত্যাচার করি নি শাসন!

ধিক্ ধিক্ নির্বাসিত রাজা। আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস অশ্রু!—

মর্তরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক আজি অন্তরের সিংহাসনতলে।

গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ;
এইবার শুনেছ তো দেবীর নিষেধ!
এসো প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা ক'রে
রামজানকীর মতো যাই নির্বাসনে।

গোবিন্দ। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে। এসো
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে— আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।

গুণবতী। ভিক্ষা
রাখো নাথ!

গোবিন্দ। বলো দেবী!

গুণবতী। হোয়ো না পাষাণ।
রাজগর্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু

আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক হৃদয় !
তুমি তো নিষ্ঠুর কভু ছিলে নাকো প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ ! কে তোমারে
আমার সৌভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া !
করিল আমারে রাজাহীন রানী !

গোবিন্দ। প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস করো একবার শুধু,
না বুঝিয়া বোঝো মোর পানে চেয়ে ! অশ্রু
দেখে বোঝো, আমারে যে ভালোবাস সেই
ভালোবাসা দিয়ে বোঝো— আর রক্তপাত
নহে। মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না, নিরাশ কোরো না আশা দিয়ে।—
যাবে যদি মার্জনা করিয়া যাও তবে।

[গুণবতীর প্রস্থান

গেলে চলি ! কী কঠিন নিষ্ঠুর সংসার !—
ওরে, কে আছিস ?— কেহ নাই ? চলিলাম !
বিদায় হে সিংহাসন ! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরকক্ষ

গুণবতী

গুণবতী। বাজা বাদ্য বাজা, আজ রাত্রে পূজা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পুরিবে। আন্ বলি।
আন্ জবাফুল। রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা
শুনিবি নে? আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে,
তাই ব'লে এতটুকু রানী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিংকরকিংকরী?
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ! ত্বরা করে
কর্ গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার!
মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে!

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি

রঘুপতি। দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরই কাছে

সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে !
পাষাণচরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি ! হা হা হা হা !
কোন্ দানবের এই ক্রুর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া !
মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ ।
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর ! দে ফিরায়ে !
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী !

নাড়া দিয়া

শুনিতে কি
পাস ? আছে কর্ণ ? জানিস কী করেছিস ?
কার রক্ত করেছিস পান ? কোন্ পুণ্য
জীবনের ? কোন্ স্নেহদয়াপ্রীতি-ভরা
মহা হৃদয়ের ? থাক্ তুই চিরকাল
এইমত— এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস !
দিব তোর পূজা প্রতিদিন পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে । তোর পরিচয়, কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব— শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে ।

কার কাছে কাঁদিতেছি !
তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও

হৃদয়দলনী পাষাণীরে ! লঘু হোক
জগতের বক্ষ।

দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষেপ
মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। জয় জয় মহাদেবী !—
দেবী কই !

রঘুপতি। দেবী নাই।

গুণবতী। ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষশান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মার পূজা।
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া করে
দেবীরে ফিরায়ে আনো শুধু, আজি এই
এক রাত্রি-তরে।— কোথা দেবী ?

রঘুপতি। কোথাও সে
নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।

গুণবতী। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী ?

রঘুপতি। দেবী বল
তারে ! এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী,
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী ? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি

মূঢ় পাষাণের পদে ? দেবী বল তারে !
পুণ্যরক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।

গুণবতী। গুরুদেব, বধিয়ো না
মোরে। সত্য করে বলো আরবার। দেবী
নাই ?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই ?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই !
তবে কে রয়েছে ?

রঘুপতি। কেহ নাই। কিছু নাই।

গুণবতী। নিয়ে যা, নিয়ে যা পূজা ! ফিরে যা, ফিরে যা
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পিতা !

রঘুপতি। জননী, জননী, জননী আমার !
পিতা ! এ তো নহে ভৎর্সনার নাম ! পিতা ?
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে। আহা, ডাক্ আরবার !

অপর্ণা। পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।

পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া
গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দ। দেবী কই?

রঘুপতি। দেবী নাই।

গোবিন্দ। একি রক্তধারা!

রঘুপতি। এই শেষ পুণ্যরক্ত এ পাপমন্দিরে।
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে
হিংসারক্তশিখা!

গোবিন্দ। ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।

গুণবতী। মহারাজ!

গোবিন্দ। প্রিয়তমে!

গুণবতী। আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।

[প্রণাম

গোবিন্দ। গেছে পাপ! দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

অপর্ণা। পিতা, চলে এসো!

রঘুপতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল— জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী!

অর্পণা। পিতা, চলে এসো!

—

গ্রন্থপরিচয়

স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্‌-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা, এ কী! এ-যে রক্ত!' বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।... এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।

—রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি

১২৯২ বঙ্গাব্দে বালক পত্রে[১] আর ১২৯৩ সালে গ্রন্থাকারে 'রাজর্ষি' উপাখ্যান প্রচারিত হয়; 'রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত' বিসর্জন ১২৯৭ সালে (২ জ্যৈষ্ঠে ?) প্রথম প্রকাশিত; ইহাতে পাঁচটি অঙ্ক ও প্রথমাদিক্রমে বিভিন্ন অঙ্কে তিন, সাত, চার, সাত ও আট (মোট উনত্রিশ) দৃশ্য দেখা যায়। উহাতে, প্রচলিত নাটকে যে-সকল পাত্রপাত্রী দেখা যায় তাহা ছাড়া বালক 'তাতা' বা 'ধ্রুব'র দিদি 'হাসি' এবং অপর্ণার বৃদ্ধ অন্ধ পিতা এই দুটি বিশেষ চরিত্র অধিক ছিল।

প্রথম-প্রচারিত বিসর্জন, বহুবিধ সংস্কার সাধন করিয়া, ১৩০৩ আশ্বিনের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে গৃহীত হয়; ইহাতে পূর্বোক্ত পাত্রপাত্রী-গণের মধ্যে 'অন্ধ বৃদ্ধ' ও 'হাসি' এই দুইটি চরিত্র বাদ দেওয়া হয়, এবং পাঁচটি অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যাও হয় একুশটি মাত্র। মোটের উপর এই 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণের অনুসরণ করিয়া '১ আষাঢ়, ১৩০৬ সাল' -অঙ্কিত 'দ্বিতীয় সংস্করণ' পরে প্রচারিত হয়।[২] পূর্বোক্ত সংস্করণ

হইতে ইহার বিশেষ পার্থক্য এই যে, কাব্যগ্রন্থাবলী-ধৃত পঞ্চম অঙ্কের চারিটি দৃশ্যকে এ স্থলে দুইটি মাত্র দৃশ্যে সংহত করার প্রয়োজন হইয়াছে এবং এজন্য উহার দ্বিতীয়[৩]-তৃতীয়[৪]-যোগে ইহার প্রথম দৃশ্যের, তেমনি প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যের যোগে দ্বিতীয় দৃশ্যের রচনা[৫]— উপরন্তু এই দ্বিতীয় বা শেষ দৃশ্যের শেষে 'পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া রাজার প্রবেশ', গুণবতীর পুনঃপ্রবেশ এবং অপর্ণার 'পিতা, চলে এসো!' বাক্যে নাটকের সমাপ্তি— এটুকু একেবারেই নূতন।

বিশ্বভারতী-কর্তৃক বিসর্জন নাটকের 'তৃতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে; ইহাতে প্রথম-মুদ্রিত গ্রন্থের বহুলাংশ নানা-পরিবর্তন-সহ পুনরায় গৃহীত হয় এবং 'তাতা'র দিদি 'হাসি'কেও পুনরায় দেখিতে পাই। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৮, ১০, ১১ ও ১৫ ভাদ্র তারিখে (২৫, ২৭, ২৮ অগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ১৯২৩) রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় কলিকাতায় 'এম্পায়ার থিয়েটর'এ বিসর্জন নাটকের যে অভিনয় হয় এবং যাহাতে বর্ষীয়ান কবি নিজেই যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন,[৬] আশ্চর্যের বিষয়, এই 'তৃতীয় সংস্করণ' কোনো দিক দিয়াই তাহার অনুরূপ নহে।[৭] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, কাব্যগ্রন্থাবলী ও দ্বিতীয় সংস্করণের আধারে, নূতন একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন— উহাই বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। কাব্যগ্রন্থাবলী ও দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পঞ্চম অঙ্ক লইয়া এ কথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে— বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে এক দিকে পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য-বিভাগে বা সন্নিবেশে কাব্যগ্রন্থাবলীর অনুসরণ করা হইয়াছে আর অন্য দিকে দ্বিতীয় সংস্করণে শেষ দৃশ্যেরও যে শেষটুকু কাব্যগ্রন্থাবলীর অতিরিক্ত তাহাও যথাস্থানে অর্থাৎ সব-শেষে সন্নিবিষ্ট আছে।

১৩২৯ কার্তিকে শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' নাট্যের অধ্যাপনা-কালে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন, তাহাতে নাটকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন ; উহা এ স্থলে সংকলন করা গেল—

'বিসর্জন' এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন করে হয়েছে ? আমরা দেখতে পাই যে, নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু, এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর-এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।

সুতরাং, প্রতিমাবিসর্জন এই নাটকের শেষ কথা নয়, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল জয়সিংহের আত্মত্যাগ ; কারণ, তখনই, রঘুপতি সুস্পষ্ট ভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারল যে, প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়। এই মৃত্যুতে সে বুঝতে পারল যে, সে যা হারালো তা কত মূল্যবান। ছাগশিশুর পক্ষে প্রাণ কত সত্য জিনিস সে কথা অপর্ণাই বুঝেছিল, কিন্তু রঘুপতির পক্ষে তা বুঝতে সময় লেগেছিল। সে প্রিয়জনকে নিদারুণভাবে হারিয়ে তার পর অনুভব করতে পারল যে, প্রাণের মূল্য কত বেশি, তাকে আঘাত করলে তার মধ্যে কত বেদনা।

এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে— প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল। তাঁর চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম হল জয়যুক্ত।

নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রানী গুণবতী। তাঁর

সন্তান হয় নি বলে সন্তানলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বললেন, 'আমাকে দয়া করে সন্তান দাও। আমার সব আছে, দাস দাসী প্রজা কিছুরই অভাব নেই—কিন্তু আমার তপ্ত বক্ষে, আমার প্রাণের মধ্যে, আর-একটি প্রাণকে অনুভব করবার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি হবে।' শিশু তো একটুকু প্রাণের কণিকা, কিন্তু তাকে স্নেহ করবার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে, বাঁচিয়ে তুলে, সে তার প্রতি তার সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা অর্পণ করবে।

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন?

তার কারণ হচ্ছে, প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একটুখানি যে প্রাণ প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশি। এক দিকে রানী মানত করছেন যে, বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলি দেবেন; অন্য দিকে তিনি সে বলির পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসাটুকু ভোগ করতে চান। এক দিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ; অন্য দিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড়ো জিনিস তা বুঝেছেন। সুতরাং, রানীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে—তিনি জানছেন, ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হতে পারে যে তার জন্য লোকে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে—আবার অপর পক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে নি।

তার পর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল, সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বললে, 'তুমি যদি এক দিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে লালন পালন করবার জন্য ব্যাকুল

হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ— তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে উদ্দেশ্যসাধন করতে চাও! বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণীহত্যায় খুশি হন? যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে এ [ভাবে] ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ?' মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কী করে বিশ্বে প্রকাশ পায়, অপর্ণা প্রথম দৃশ্যে সেই কথাটা বলে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্য এক শত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজী আছেন— অথচ চিন্তা করে দেখলেন না যে, এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে।

প্রাণের মূল্য কত গভীর এক দল সে কথা বুঝেছে, অন্য দল তা বোঝে নি— তাই দুই দলে বিরোধ বাধল। গুণবতী ও রঘুপতি এক দিকে এবং গোবিন্দমাণিক্য জয়সিংহ ও অপর্ণা অন্য দিকে।

জয়সিংহ রঘুপতিকে পিতার মতো ভক্তি করত, সে বাল্যকাল থেকে মন্দিরের সকল অনুষ্ঠান ও পশুবলি দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই, যেখানে ভালোবাসা সেখানে রক্তপাত চলে না এই উপলব্ধি তার মনে সম্পূর্ণরূপে স্থান পেতে দেরি হয়েছিল। অপর্ণার ক্রন্দনেই প্রথমে তার পূর্ববিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হতে শুরু হল। গোবিন্দমাণিক্য এই পশুবলির মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না, কিন্তু জয়সিংহ শিশুকাল থেকে রঘুপতির কাছে মানুষ হয়েছে, যখন তার বিচার করবার শক্তি জন্মায় নি তখন থেকে এই রক্তপাত দেখে দেখে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই তার মনে দুই ভাবের বিরোধ উপস্থিত হল— রঘুপতির প্রতি ভক্তি ও বলির জন্য চিরাভ্যাসের জড়তা, এই অভ্যাসের কঠিন বন্ধন তার মনকে কতকটা অসাড় করে দিয়েছিল, অথচ সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিল যে কত বড়ো অন্যায়কে সে সমর্থন করে এসেছে।

অপর্ণা এসে জয়সিংহের মনকে চঞ্চল করে দিল। যে জীবকে অপর্ণা

কোলে করে পালন করেছে তারই রক্তধারা মন্দিরের সোপান বেয়ে পড়ছে এই দৃশ্য দেখে সে কেঁদে উঠল। জয়সিংহের মন তাতে নাড়া খেল, সে প্রতিমার দিকে ফিরে বলল, 'এ কী তোমার মায়া! এই হত্যায় মানুষের প্রাণ কেঁদে উঠছে, আর তুমি বিশ্বজননী হয়ে এতে সায় দিচ্ছ, তোমার কি দয়া নেই!' জয়সিংহের মন প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল; সে এই প্রথম আঘাত পেল, তার পর ক্রমে তার মনের মধ্যে এই সংগ্রাম বর্ধিত আকার ধারণ করল। দুই শক্তি জয়সিংহকে দুই দিক হতে আকর্ষণ করতে লাগল। এক দিকে অপর্ণা তাকে মন্দির ত্যাগ করতে বলছে, অপর দিকে রঘুপতি তাকে মন্দিরের সীমানায় ধরে রাখতে চায়।

রঘুপতির মনে দয়ামায়া নেই, সে নিষ্ঠুর প্রথাকে পালন করে এসেছে এবং এমনিভাবে শক্তিলাভ করে বড়ো হয়ে উঠেছে। সে দেবীর সেবক বলে লোকের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়ে এসেছে। সে জয়সিংহকে তার স্বপক্ষে আনতে চায়, মন্দিরের প্রথার গণ্ডির মধ্যে বাঁধতে চায়। কিন্তু অপর্ণা আর-এক বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ে জয়সিংহের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বললে, 'এই নির্দয় পূজার মধ্যে তুমি বাস কোরো না, তুমি মন্দির ত্যাগ করে বেরিয়ে এসো।' জয়সিংহের মনে তখন বিরোধ বেধে গেল। এক দল লোক বাহ্য শক্তি ও প্রাচীন প্রথাকে চিরন্তন করে রাখতে চায়; অন্য দল বলছে প্রেমই সব চেয়ে বড়ো জিনিস। জয়সিংহ এই দোটানার মাঝখানে পড়ল এবং কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা করে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

রঘুপতি পণ্ডিত, বৃদ্ধ, সম্মানিত ও শক্তিশালী। আর, অপর্ণা বালিকা, ভিখারিনী ও সমাজে অখ্যাত। কিন্তু, যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্বল বলে মনে হয়, কিন্তু কার্যত তারই জয় হল। অথচ, রঘুপতি শক্তিশালী— তার

দিকে শাস্ত্রমত দেশাচার লোকমত সব রয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে বিশ্বমাতার মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। প্রেমের সৈন্যসামন্ত অর্থপ্রতিপত্তি কিছুই নেই, কিন্তু হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে।

কার্তিক ১৩২৯

[১] ১২৯২ সালে আষাঢ় হইতে মাঘ পর্যন্ত মোট সাতটি সংখ্যায় মুদ্রিত। পত্রিকায় আখ্যায়িকার মুদ্রণ শেষ হয় নাই।

[২] ১৩০৩ আশ্বিনে মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থাবলীর আধারে যেভাবে এই সংস্করণ প্রস্তুত করা হয় তাহা শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সৌজন্যে দেখা গিয়াছে। উক্ত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি দেখিয়া নাটকশেষের একটি প্রমাদ (পৃ. ১১৯) সংশোধন-পূর্বক বর্তমানে (১৩৬৮) ছাপা হইল ; এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা ! / 'এবারে দিয়েছে দেখা' এই ভুল পাঠ প্রথমাবধি প্রচলিত ছিল।

১৩৩০ ভাদ্রে কলিকাতায় 'এম্পায়ার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত বিসর্জনের বহুশঃ পরিবর্তিত এক 'ষ্টেজ কপি'তে (শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ পাণ্ডুলিপি ১৩৪) ঠিক এই অংশটুকু পাওয়া যায় কবির স্বহস্তের লেখায়। তাহাতেও পূর্বোক্ত শুদ্ধপাঠ স্পষ্টাক্ষরে লেখা হয় : এবার দিয়েছে দেখা ইত্যাদি।

[৩] এই দৃশ্যে প্রাসাদে গোবিন্দমাণিক্য ও নয়নরায়। গোবিন্দ-মাণিক্যের 'এখনি আনন্দধ্বনি !' ইত্যাদি খেদোক্তি। গুণবতীর প্রবেশ ও প্রস্থান। রাজার প্রস্থান।

[৪] অন্তঃপুরকক্ষে গুণবতী : বাজা বাদ্য বাজা ! আজ রাত্রে পূজা হবে ইত্যাদি।

৫ অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণে ঝড়ের মধ্যে এই শেষ দৃশ্যের অবতারণা। জয়সিংহের প্রবেশ ও আত্মদান, অপর্ণার মূর্ছা, রঘুপতির প্রতিমার পদতলে 'ফিরে দে' 'ফিরে দে' বলিয়া ব্যর্থ কাতরতা— ইহাতেই এই দৃশ্যের উপর সাময়িক যবনিকাপাত হয় নাই; অল্প পরেই রঘুপতি উঠিয়া রোষে ক্ষোভে বলেন—

দেখ, দেখ, কি করে দাঁড়ায়ে আছে জড়—
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্ব্বোধের মত

এবং তাহার পর প্রতিমা নদীস্রোতে নিক্ষেপ হইতে গুণবতীর প্রবেশ ও প্রস্থান, অপর্ণার 'প্রবেশ' (মূর্ছাপগম? মূর্ছাভঙ্গ বা প্রস্থানের কথা পূর্বে বলা হয় নাই) ও রঘুপতিকে 'পিতা'-সম্বোধন, রাজার প্রবেশ, গুণবতীর পুনঃপ্রবেশ— এ-সবই অবিচ্ছেদে চলিতে থাকে। অপর্ণার মূর্ছা ও রঘুপতির শোক এক দিকে আর অন্য দিকে অপর্ণার মূর্ছাভঙ্গে রঘুপতিকে পিতৃ-সম্বোধন, উভয়ের মধ্যে প্রাসাদের বিভিন্ন দৃশ্য আনা হয় নাই। মনে হয় অভিনয়ের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবিয়াই কবি কাব্যগ্রন্থাবলীর দৃশ্য-ভাগ ও সন্নিবেশকে পুনরায় বহাল করেন। কাব্যগ্রন্থাবলী আবার এ বিষয়ে পূর্বগামী প্রথম-প্রচারিত গ্রন্থের অনুরূপ।

৬ বিসর্জনের একাধিক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রযোজনা ও ভূমিকা-গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৮৯০ ও ১৯০০ খৃস্টাব্দে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন জানা যায় আর ১৯২৩ খৃস্টাব্দে জয়সিংহের ভূমিকায়। প্রত্যেক অভিনয়-কালে তৎকাল-প্রচলিত গ্রন্থের উপর নানা পরিবর্তন হইয়া থাকিবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় আর নূতন গান সংযোজন করা হয় তাহারও প্রমাণ আছে।

১৯২৩ সনের বিসর্জন-অভিনয় তিন দিন হইয়াছিল এ ধারণা বহুপ্রচলিত হইলেও, শ্রীমতী সাহানাদেবী বলেন চার দিন আর তৎকালীন খবরের কাগজ দেখিলেও তাহাই জানা যায়।

[1] অত্যল্প সমকালীন বিবরণ, পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপি-১৩৪ এবং মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্র (১৩৩০) হইতে যতদূর জানা যায়, ১৩৩০ ভাদ্রের নাট্যরূপে—

একই দৃশ্যের পটভূমিতে আদ্যন্ত অভিনয় প্রায় অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত।

চাঁদপাল চরিত্রটি বর্জিত।

সেনাপতি নয়নরায়ের পদত্যাগ, নির্বাসিত নক্ষত্ররায়ের ত্রিপুরা-আক্রমণ, এজন্য গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসন ত্যাগ, এ সবের কোনো প্রসঙ্গ স্বতই আসে নাই।

জয়সিংহের আত্মদানের প্রাক্‌কালে ঝড়ের রাত্রে জনতার প্রবেশ ও প্রস্থান (তৃতীয় সংস্করণ/১৩৩৩/পৃ. ১৩১-৩৪) থাকিলেও পরে রানী গুণবতীর অবতারণা নাই। কিন্তু অন্তিম মূহূর্তে রাজার উপস্থিতি ও জয়সিংহের দেহে পুষ্পাঞ্জলি-বর্ষণ আছে বা ছিল।

এ অভিনয়ে যে নূতন গানগুলি যোগ করা হয়, মন্দিরের স্বচ্ছন্দচারিণী ভৈরবীর বেশে সেগুলি গান করেন শ্রীমতী সাহানাদেবী— কখনো বা নেপথ্যেই গাওয়া হয়।

পরিশেষে বলা আবশ্যক, বহু-বিষয়ভার-বর্জনে নাট্যাভিনয়ের এই-যে চমৎকারজনক একাগ্র ঋজুগতি ও দ্রুতি, ইহা এ দেশের নাট্য-প্রযোজনায় নূতন হইলেও এ ক্ষেত্রে একেবারে অপ্রত্যাশিতও নয়। কেননা, প্রায় ৭ বৎসর পূর্বে (মে ১৯১৬/জৈষ্ঠ ১৩২৩) জাপান-যাত্রী কবি জাহাজে বসিয়া এ নাটকের যে ইংরেজি রূপান্তর-সাধন করেন (*Sacrifice*, 1917), তাহাতে এ-সবই লক্ষ্য করা যায়। সেই নাট্য-রূপের তনুতা আলোচ্য রূপের তুলনায় বেশি বৈ কম হইবে না।

গ্রন্থপরিচয়-সংকলন : কানাই সামন্ত